



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 532 - 541

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

প্রোফেসর শঙ্কু : কল্পবিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে

সুদেব বোস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: titu.83.4bose@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Science fiction,
Satyajit Ray,
International,
Bengalee,
European
Literature,
Money-mongers.

Abstract

Scientist and writer, who was none but Acharya Jagadish Chandra Bose had opened the way of writing science fiction in Bengali. But Satyajit Ray is the most popular and accepted writer in that faculty. His stories of Professor Shanku is on the top of best sellers list, even today. But He never thought of making a series which would last for long years. Due to a huge acceptance he planned to continue that series. In his 32 shonku-stories he portrayed a character of scientist and also of a great human being. Shonku faced the money-mongers with his innovation and intelligence. Satyajit Ray also portrayed some animals who became personified. Thus his stories crossed the limit of science-fiction and became a humanist character. Beside all these Ray always given shonku a warm shade of bengalee gentleman who is always proud of his city, culture and principle. In four stories we tried to explain all these features of that loveable character. But it is a misfortune that bengalee science fiction got no reception in world stage. European science fiction writers are famous in all over the world. But Adrish Bardhan, Anish Dev, Premendra Mitra got no fame as science fiction writings which they deserved. Satyajit Ray made a legacy of his own but that too in film. We had to accept that misfortune but also we should be glad that a legend like Satyajit Ray had done his works in Bengali Literature.

Discussion

১৮৯৬ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন তাঁর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গল্পটি যেটির পরে নাম হয় 'পলাতক তুফান'। পৃষ্ঠটান বা Surface tension তত্ত্বের প্রয়োগে লেখা এই গল্পটি তর্কযোগ্যভাবে বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের সূচনাবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুপরিচিত উপন্যাস 'বেনের মেয়ে'-তেও পৃষ্ঠটান তত্ত্বের প্রয়োগ ছিল। সেখানে একটি দৃশ্যে প্রচুর তেল ঢেলে ঝঞ্ঝাবিস্ফুরক সমুদ্রকে শান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বেনের মেয়েকে কেউ কখনোই কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী বলেননি। কারণ এই উপন্যাসে ঐ বৈজ্ঞানিক বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে মাত্র কোন নিয়ন্ত্রক ভূমিকা নেয়নি।

এই ঘটনা থেকেই কল্পবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি আমরা বুঝে নিতে পারি। বিজ্ঞানবিষয়ক গল্পমাধ্যেই কল্পবিজ্ঞান নয় এটা যেমন ঠিক তেমন এটাও সত্যি যে নির্ভুলভাবে কল্পবিজ্ঞানের গল্পকে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। ‘Encyclopedia of Science fiction’ এ যে মান্য সংজ্ঞাটি পাওয়া যাচ্ছে তা হল –

“A literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction of estrangement and cognition, and whose main formal device is an imaginative framework alternative to the author's empirical environment.”^১

আবার অনেকক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মিশে থাকে কল্পনা, তাই Science Fantasy নামটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়। পাশ্চাত্যের তুলনায় এদেশের মানুষের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা পড়ার অভ্যাস যেহেতু কম, এবং গড়পড়তা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ধারণাও কিছুটা নূন তাই বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্প অনেকক্ষেত্রেই Science Fantasy হয়ে উঠেছে। যেখানে গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তুলনায় সুখপাঠ্যতাই প্রধান এবং কল্পনা তাঁর প্রধান বাহন।

একই সঙ্গে এটাও সত্যি বাংলায় কল্পবিজ্ঞানচর্চাও যথেষ্ট কম। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন ‘ময়নামতির মায়াকানন’ বা ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’ শ্রেণির লেখা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা কাহিনিগুলিতে আদর্শ বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার মেজাজ রয়েছে। এমন অনেক গল্পই আছে যেখানে পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের প্রাথমিক জ্ঞান ছাড়া প্রবেশ করাই কঠিন। পরবর্তী সময়ে লীলা মজুমদার থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সকলেই কদাচিত কল্পবিজ্ঞান শ্রেণির লেখা লিখেছেন কিন্তু তাঁরা প্রধানত পরিচিত সাহিত্যিক হিসেবে, বিজ্ঞানলিখিয়ে হিসেবে নয়।

পত্রপত্রিকার জগতে অদ্রীশ বর্ধন কল্পবিজ্ঞানকে এনেছিলেন ‘আশ্চর্য’ পত্রিকার মাধ্যমে (১৯৬৩)। তারও কয়েক বছর আগে কমলকুমার মজুমদার বের করেছিলেন বিশুদ্ধ গণিতচর্চার পত্রিকা ‘অঙ্ক ভাবনা’। কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং বাঙালি পাঠকের অনুৎসাহের পাশাপাশি লেখকদেরও হয়তো কিছুটা দায়িত্ব ছিল। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন-

“বয়স্কদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মত গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না।”^২ কথাতা কল্পবিজ্ঞানের রচনা সম্পর্কেও সত্যি। তাত্ত্বিক দুর্গমতা থাকলে সাধারণ পাঠক সেদিকে আকর্ষিত হবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই ১৯৬১-তে সত্যজিৎ রায়ের কলমে যখন ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ চরিত্রটির জন্ম হল তখন বিজ্ঞান সেখানে অবশ্যই রইল কিন্তু আরো বেশি করে থাকল কল্পনা, কৌতুক আর মানবিক দিকগুলো। সেজন্যই প্রোফেসর শঙ্কু সম্পর্কিত আলোচনার এই শিরোনামটি আমরা বেছে নিয়েছি যাতে শঙ্কু কীভাবে একজন বিজ্ঞানীর সীমা পেরিয়ে একজন পাঠকের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন তা ধরা যায়।

সত্যজিৎ সিনেমাজগতে পদার্পণ করার আগে ‘হিরে মানিক’ বা ‘দেড়শো খোকার কাণ্ড’ এর মত ছোটদের ছবি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রথম ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ এ বোঝা গিয়েছিল ছোটদের ছবির ভাষাটা ঠিক কী হওয়া উচিত। তেমনই সত্যজিতের আগে বাংলা সাহিত্যে ছোটদের জন্য লেখা হলেও Child Psychology ধরার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ অদ্বিতীয়। যদিও এখানে অস্বীকার করা যায় না তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যকে। শিশু সাহিত্যের বৃহত্তম সম্ভার বাংলার পাঠককে উপহার দিয়েছেন রায়পরিবার। যেখানে রামায়ণ মহাভারত যেমন আছে তেমনই আছে জীবজন্তুদের বিচিত্র কাহিনি, যা সহজে মন টানতে পারে ছোটদের। উপেন্দ্রকিশোরের ‘সেকালের জানোয়ার’ বইটার পাশে সুকুমার রায়ের ‘হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়ারি’ এবং সত্যজিতের শঙ্কুর প্রথম গল্প ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়ারি’ রাখলেই বোঝা যাবে বিজ্ঞান, কল্পনা আর কৌতুক মিশিয়ে ছোটদের সম্ভার সাজানোয় তাঁদের বিশিষ্টতা কোনখানে।

১৯৬১-এর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর তিনটি সংখ্যায় বেরিয়েছিল ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়ারি’ যা পরে স্থান পায় নিউ এজ পাবলিশার্স প্রকাশিত ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ বইতে। শঙ্কুর ডায়ারি আবিষ্কারের ইতিহাসের পাশাপাশি টাফা গ্রহে অভিযানের কাহিনি রয়েছে এই রচনায়। ডায়ারির আকারে লেখা এই গল্পের শুরু হয়েছে ১লা জানুয়ারি তারিখে।

সাতাশ বছরের পুরনো চাকর প্রহ্লাদের সর্দারিতে নিজের বিদঘুটে চেহারাটা দেখে ভিরমি খান শঙ্কু। চটে গিয়ে তার ওপর প্রয়োগ করেন নিজের আবিষ্কার ‘নস্যাস্ত্র’ বা snuff gun. এছাড়া রকেট, জ্বন্তুগাস্ত্র ও fish pill এর কথাও

এখানে রয়েছে। শেষের বস্তুটি তৈরি করেন প্রিয় পোষ্য নিউটনের কথা ভেবে। এ গল্পে নিজের সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি লক্ষ্যণীয় -

“আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে আমি যে জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়ই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে।”

“বাইরের কোনো জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে, এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত।”

মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বিদ্যুটে জানোয়ারের তাড়া খেয়ে কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালানো এবং তারপর টাফা গ্রহে গিয়ে পৌঁছানো, কাহিনির সারমর্ম এটাই। অতিকায় পিঁপড়ের মত মানুষদের মধ্যেই থেকে যান শঙ্কু, প্রহ্লাদ, নিউটন এবং যন্ত্রমানব বিধুশেখর। গল্পটিতে বিজ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে অলৌকিক কল্পনা এবং মজাদার উপস্থাপন। কিন্তু বিধুশেখর এখানে আলাদাভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

সাড়ে পাঁচ মণ ওজনের বিধুশেখর কলকজা দিয়ে তৈরি একটি মানুষের মত যন্ত্র। শঙ্কু জানেন তার নিজের ভাবনা বা চিন্তা শক্তি নেই। তা সত্ত্বেও সে অনায়াসে বলে দেয় ভেলোসিলিকা মিশিয়েই তৈরি হবে একটি বিশেষ যৌগ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান মনে রেখে নিজস্ব অদ্ভুত উচ্চারণে গাইতে পারে। আবার মঙ্গলগ্রহে অজানা প্রাণীর দিকে প্রবল আকর্ষণে ছুটে যেতে পারে। শঙ্কু ভাবেন “ওর মনের ওপর চাপটা হয়তো বেশি পড়ে গিয়েছিল।” অথচ যন্ত্রমানবের যে মন নেই তা সর্বজনবিদিত। ব্যোমযাত্রীর ডায়রি প্রথম শঙ্কুকাহিনি এবং এতে মজা কৌতুকের অংশই বেশি। রচনাটির অলংকরণ দেখলেও সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এর কয়েক বছর পর ১৯৬৮ এর ফেব্রুয়ারি মার্চে ‘সন্দেশ’ এ সত্যজিৎ লিখলেন ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু’। জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পমার এর আমন্ত্রণে যাওয়ার আগে এই রোবটশ্রেণির বস্তুটি তৈরি করেন শঙ্কু।

বিধুশেখরকে বানানোর ক্ষেত্রে শঙ্কুর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা যায়নি। এখানে শঙ্কু স্পষ্টই জানিয়ে দেন-

“ভবিষ্যতে হবে ল্যাবরেটরির সমস্ত কাজে আমার সহকারী যাকে বলে রাইট হ্যাণ্ড ম্যান।”

মানুষের যেখানে ব্রেন থাকে রোবুর সেখানেই ছিল একগাদা ব্যাটারি, ভালভ, ইলেকট্রিক তার ইত্যাদি কাজেই সুখ, দুঃখ, রাগ বা হিংসে রোবুর আসে না। তাকে দেখতেও সুদর্শন নয়, চোখ টা়া এবং ঠোঁট নেই। কিন্তু তার অসামান্য কৃতিত্ব হল দশ সেকেন্ডের মধ্যে যেকোনো কঠিন অঙ্কের সমাধান করে ফেলা। পঞ্চাশ হাজার ইংরেজি, বাংলা এবং দশ হাজার জার্মান প্রশ্নের উত্তর সে জানে।

আগেই বলা হয়েছে বিধুশেখরের ক্ষেত্রে শিশুসুলভ কৌতুকই ছিল প্রধান। বিধুশেখরের কাজগুলো ছিল বিদ্যুটে অদ্ভুত। ১৯৬১ সালের গল্প সেটা, তখন সত্যজিৎ নতুনভাবে প্রকাশ করছেন ‘সন্দেশ’। কিন্তু সাতবছর পর রোবুর গল্পটা লেখার সময় তিনি শঙ্কুকাহিনিকে বিশেষ একটা ভাবনার মধ্যে এনে ফেলেছেন। সেই গল্পে মানুষের লোভ আছে, শঠতা আছে, ভয়াবহ পরিস্থিতি আছে, শঙ্কুর বিপদে পড়া এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া আছে। এবং অবশ্যই যা আছে তা হল বিজ্ঞানবিষয়ক কল্পনা। এই গল্পটা সেকারণেই একটা গায়ে কাঁটা দেওয়া রহস্যগল্পের মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

রোবু অঙ্ক জানে দেখে তাকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন জার্মান বিজ্ঞানী গটফ্রীড বোর্গেল্ট। তাঁরও আজীবনের গবেষণা রোবু নিয়ে। কোটি কোটি মার্ক খরচ করেও তাঁর রোবু নিখুঁত হয়নি কারণ সে অঙ্ক জানে না। শঙ্কু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তিনি শক দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে যান। সেইসময় শঙ্কুর রোবু এসে তার প্রাণ সংহার করে, সভয়ে বিস্মিত শঙ্কু দেখেন এতক্ষণ তিনি যার সঙ্গে কথা বলেছেন সে আসলে বোর্গেল্টের নিজের তৈরি রোবু! আসল বোর্গেল্টকে সেই রোবুই বন্দী করে রেখেছিল।

শঙ্কুর বেশিরভাগ কাহিনিই অসৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু এই গল্পের মত অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাঁকে আর কখনো লড়াইতে হয়নি।

‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ আর ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু’ গল্পের মধ্যে সময়ের তফাত এর পাশাপাশি ভাষাগতভাবেও পার্থক্য রয়েছে অনেকটাই। প্রথম গল্পে স্বপ্ন দেখে দাড়ি পেকে যাওয়া বা প্রহ্লাদের নিউটনকে বগলে নিয়ে ছোট্ট মত মজার ঘটনা আছে। বিধুশেখর সেখানে রাগলে গোঁগোঁ শব্দ করে। শঙ্কুর কথাগুলো এরকম -

“আহা! যত সব ন্যাকামো! / ওরা যে এখনো হাঁচতেই শেখেনি”।

পরের গল্পে রোবু কৃত্রিম বোর্গেল্টের মাথাটা টেনে আলাদা করে দেয়। ভিনগ্রহের কাল্পনিক অদ্ভুত পরিবেশ নয়, জার্মানি এই গল্পের ঘটনাস্থল। বোর্গেল্টের পরিবারের রহস্যময় ইতিহাস বা তার আচরণ সবই একটা সিরিয়াস আবহাওয়া তৈরি করে। এখানে শঙ্কুর বক্তব্যের ধরণও একেবারেই আলাদা -

“পমার আর বোর্গেল্টের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র চলছে না তো?”

“হাইডেলবার্গের বিভীষিকার কথা কোনদিন মন থেকে মুছবে বলে মনে হয় না।”

সর্বোপরি এই গল্পে সত্যজিৎ ব্যবহার করেছেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্লট যার ফলে এটি একটি উপভোগ্য বিজ্ঞানকেন্দ্রিক এবং রহস্যময় গল্প হয়ে উঠেছে। শঙ্কু এবং যন্ত্রমানব দুয়েরই উত্তরণ ঘটেছে এখানে।

সত্যজিতের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তারা সকলেই এই স্রষ্টার যে বৈশিষ্ট্যটির কথা শঙ্কুর সঙ্গে স্মরণ করেছেন তা হল Encyclopedic Knowledge। তাঁর মানসচরিত্র ফেলুদার মধ্যেও এটা দেখা যায় এবং লালমোহনবাবুও পরের দিকে লেখাকে নির্ভুল করার জন্য এইসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ব্যবহার করতেন। নিরলস জ্ঞানপিপাসু সত্যজিতের উৎসাহের তালিকায় নিশ্চয় ছিল ভিনগ্রহের প্রাণীরা, যাদের নিয়ে আলোচনা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে। বিশ্বখ্যাত লেখক এরিক ফন দানিকেনের Chariot of the Gods বইটি তাঁর অন্যতম নিদর্শন। প্রোফেসর শঙ্কুর একাধিক কাহিনিতেও এ প্রসঙ্গ এসেছে যার মধ্যে দুটি গল্প বর্তমানে আলোচ্য।

১৯৬৫ এর মে মাসের সন্দেশ এ বেরিয়েছিল ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য’ গল্পটি। এ গল্পে শঙ্কুর আবিষ্কৃত যন্ত্র মাইক্রোসোনোগ্রাফ এর বিশেষ ভূমিকা আছে। এ যন্ত্রে যেকোনো ভাষার শব্দ বাংলায় অনূদিত হয়ে যায়। প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর কুড়িয়ে পাওয়া একটি অদ্ভুত বল রয়েছে এই গল্পে। সে বল ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং বদলায় আর সেটা বরফের মত ঠাণ্ডা। অবিনাশবাবুর প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল বলটিকে কাজে লাগিয়ে নিজের খ্যাতি অর্জন করা। অচিরেই সে শখে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি বলটি দিয়ে যান প্রোফেসর শঙ্কুকে। কীটপতঙ্গ তো তার সংস্পর্শে মরেই যায় এমনকী বেড়াল বা মানুষও তার কাছে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এ গল্পের সূচনাও কৌতুকের আবহে। অবিনাশবাবু এসে বলেন - “আপনাকে পই পই করে বলছি এবার রিটার্ন করুন।” এমনকি এও বলেন “খেলনাটি দেখে আপনার লোভ লাগবে কিন্তু আপনাকে দেবনা সেটি।” শঙ্কু এতে কৌতুক তো পানই পাশাপাশি নিজের নতুন যন্ত্রটা দেখিয়ে অবিনাশবাবুকে তাক লাগিয়ে দেবার কথাও ভাবেন। কিন্তু গল্পের মেজাজ পালটে যায় শঙ্কু বলটি বাড়িতে এনে রাখার পর। ১৪ই এপ্রিলের ডায়েরিতে শঙ্কুর লেখা-

“বলটা আনার পর থেকেই নিউটনের মেজাজটা যেন কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে।”

“সামান্য একটা বলের প্রতি বেড়ালের এ আক্রোশ ভারি রহস্যজনক।”

“ওই যে রং পরিবর্তনের ব্যাপারটা-ওটার মধ্যে কিসের জানি একটা ইঙ্গিত আছে।”

অচিরেই শঙ্কু আবিষ্কার করেন ঐ গোলকটি আসলে একটি অতিক্ষুদ্র গ্রহ এবং রং পরিবর্তন আসলে ঋতু পরিবর্তনের দ্যোতক। এবং সভয়ে আবিষ্কার করেন ঐ গ্রহের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস যারা পৃথিবীকে তিনমাসের মধ্যে জনশূন্য করে দিতে পারে। এই সমস্ত তথ্যই মাইক্রোসোনোগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে এসে পৌঁছায়।

ইউ.এফ.ও বা Unidentified Flying Object দীর্ঘকাল ধরেই মানুষের কৌতূহলের বিষয়। শঙ্কুর গল্পেও এর উল্লেখ আছে। কল্পবিজ্ঞানের কল্পনার সীমাকে একটু বাড়িয়ে সত্যজিৎ এই গল্পে নিয়ে এলেন একটি ছোট্ট গ্রহকে যার নাম টেরাটম। যার অধিবাসীরা বিজ্ঞানে ও ক্ষমতায় মানুষের থেকে অনেক বেশি অগ্রসর। বিজ্ঞান শঙ্কুর সাধনা হলেও মানুষের জীবন আরো অনেক বেশি মূল্যবান তাই মানবপ্রেমিক বিজ্ঞানী পৃথিবীর স্বার্থে গ্রহটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন।

একটি গ্রহ পৃথিবীতে এসে পড়ছে। সেখানে ঋতু পরিবর্তনের আভাস আছে। অক্সিজেনের অভাবে সমস্ত ভাইরাস মরে যাওয়ার পর সেটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। বিজ্ঞানকে মান্যতা দিলে কল্পনার ছাড়টুকু দিয়েও তথ্যগুলি বিশ্বাসযোগ্য হওয়া মুশকিল। আবার ভাইরাসের মত যুক্তিসঙ্গত বিষয়ও আমরা পাই এই গল্পে। বিশ্বাস্য আর অবিশ্বাস্য মিলেই তো ফ্যান্টাসির জগৎ। সত্যজিৎ তো সেই জগতেরই অবিসংবাদিত সম্রাট।

এই গল্পের চোদ্দো বছর পর সত্যজিতের কলমে আমরা পাই ‘মহাকাশের দূত’ গল্পটি, ১৯৭৯ সালের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে। শঙ্কুর অনেক গল্পেরই সূচনা হয়েছে বিদেশ থেকে আসা চিঠি দিয়ে এটি তার মধ্যেই পড়ে। ইংল্যান্ডের ব্রেন্টউড থেকে শঙ্কুর বন্ধু ফ্রান্সিস ফিল্ডিং লেখেন বারো বছর পরিশ্রমের পর তিনি মহাজাগতিক পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। ফিল্ডিং শঙ্কুর বিশিষ্ট বন্ধু যিনি বাইশ বছর অন্য গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন নিজের বাগানে ৯৫ ফুটের রিসিভার বসিয়ে এবং ২১ সেমি তরঙ্গের সাহায্যে। মৌলিক সংখ্যার মাধ্যমে তাঁর কাছে উত্তর এসে পৌঁছেছে।

আগের গল্পটিকে পাশে রাখলে আমাদের মনে পড়বে অবিনাশবাবু গ্রহটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন উশীর ধারে। তুলনায় এই গল্পের বর্ণনা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য। গল্পটির আকর্ষণীয়তা আরো বাড়ে যখন জানা যায় মিশরের একটি প্যাপিরাসের কথা যাতে লেখা আছে মানুষের মত প্রাণী আছে অন্য একটি গ্রহে। যারা প্রতি পাঁচ হাজার বছরে একবার পৃথিবীতে আসে। সেই সূত্রে শঙ্কু পৌঁছান মিশরের রাজধানী কায়রোয়। আগের গল্পের চরিত্রসংখ্যা দুই এখানে অনেক বেশি, শঙ্কুর অন্তরঙ্গ বন্ধু উইলহেলম ক্রোল, থর্নক্রফট, ব্রায়ান ডেক্সটার, ফিল্ডিং এবং গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন। শেষোক্ত ব্যক্তিটি এক আমেরিকান ধনকুবের, যিনি একটি দুস্থাপ্য প্যাপিরাস হস্তগত করেন। পাঠোদ্ধারের ফলে তিনি জানতে পারেন ভিনগ্রহের প্রাণীদের কথা এবং তাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাতে চান। ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো’ গল্পের সলোমন ব্রুমগার্টেন, ‘কর্ভাস’ গল্পের আর্গাস, ‘বাগদাদের বাক্স’ গল্পের গোল্ডস্টাইন এমন অনেক চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে এঁর। গল্পের পটভূমি রহস্যের দেশ ইজিপ্ট যা বারবার ফিরে আসে শঙ্কুর গল্পে। এ গল্পেও আছে নেখবেৎ দেবীর প্রসঙ্গ, যার প্রতীক ছিল শকুন। কল্পবিজ্ঞানের আবহকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে মিশরীয় মিথোলজির ব্যবহার সত্যজিৎ আগেও করেছেন ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক’ গল্পে। আলোচ্য গল্পটি শুধু কল্পবিজ্ঞান নয়, ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রসঙ্গ সহ একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি হয়ে উঠেছে। টেরাটম গ্রহের ভাইরাসদের ঠিক বিপরীত এদের প্রকৃতি, পৃথিবীর কল্যাণই এদের উদ্দেশ্য। তাদের দিয়ে যাওয়া একটি উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড শেষপর্যন্ত শঙ্কুর আঙুলে স্থান পায় যার আলো তাকে মানুষের কল্যাণে উৎসাহ দেয়। ‘স্বর্ণপর্দা’ গল্পে জানা যায় বাবার থেকে শঙ্কু পেয়েছিলেন মানুষের ভালো করার উপদেশ যা তাঁর জীবনের পাথেয়। শঙ্কুর ভূমিকা তাই এক মানবতাবাদী বিজ্ঞানীর যার উদ্দেশ্য পৃথিবীটাকে আরেকটু সুন্দর করে তোলা। আধুনিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কেউ পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব কায়েমের কাজে লাগাবে তা শঙ্কু মানতে পারেননা কখনোই। কখনো নিয়তি কখনো কারো অযাচিত সাহায্য বারবার জিতিয়ে দেয় শঙ্কুকে, হারতে হয় লোভী স্বার্থাশ্বেষীদের।

গোটা বৈজ্ঞানিক জীবনে প্রায় ৬৯টি আবিষ্কার করেন শঙ্কু, পৃথিবী তাঁকে স্থান দেয় টমাস আলভা এডিসনের পরেই। প্রায় প্রত্যেক গল্পেই অন্তত একটি আবিষ্কারের প্রসঙ্গ আছে যেটি গল্পের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা নেয়। ১৯৬৪ এর শারদীয়া সন্দেশ এ প্রকাশিত গল্পে শঙ্কু আবিষ্কার করলেন অদৃশ্য হওয়ার ওষুধ ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও’ গল্পে। উপাদান হিসেবে ছিল “এক্সট্রাক্ট অব গরগনাসস...বাবুই এর ডিম, গাঁদালের রস আর টিনচার আয়োডিন”, যে নামগুলো গুনলে সুকুমার রায়ের সৃষ্ট নিধিরাম পাটকেলের তৈরি সেই বিকট গন্ধের তেলের কথা মনে পড়ে। কল্পবিজ্ঞানের উত্তেজনার পাশাপাশি কৌতুকের ডালিটি সাজিয়ে দিতে ভোলেন না সত্যজিৎ।

প্রোফেসর গজানন তরফদার শঙ্কুর কাছ থেকে অদৃশ্য হওয়ার ওষুধের ফর্মুলাটি চুরি করার এক অদ্ভুত উপায় বের করেন। দক্ষিণ আমেরিকার এক সার্কাস থেকে একটি ম্যাকাও পাখি চুরি করে এনে সেটিকে পাঠিয়ে দেন শঙ্কুর গবেষণাগারে। অলৌকিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ম্যাকাওটির সাহায্যে ফর্মুলাটি হাতিয়ে ওষুধ বানাতেও সমর্থ হন প্রোফেসর তরফদার। পরে অদৃশ্য হয়ে শঙ্কুর নোটসের খাতাগুলি চুরি করতে এসে তিনি ঘায়েল হন ম্যাকাওটির হাতেই। ঘটনাচক্রে সেও তখন অদৃশ্য।

আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটিতেই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানবের প্রাণী রয়েছে। যদিও শঙ্কুকাহিনীতে এর অভাব নেই, কর্তাস, আশ্চর্য্য ইত্যাদি গল্পে যেসব প্রাণীদের আমরা পাই তারা বহুলাংশে মানুষকে ছাড়িয়ে যায়। এই গল্পটিতে শঙ্কুর চরিত্রটির ভূমিকা প্রধান নয়, অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তরফদারের শয়তানি আর ম্যাকাও এর বুদ্ধির টঙ্কর-

“ম্যাকাওটি আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় না দেখে ঠোঁটের এক কামড়ে ওষুধের বোতলটি খুলে ফেলে ঢক ঢক করে খানিকটা ওষুধ গিলে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যায়।”

“গাড়ির পিছনের সিটেই যে ম্যাকাওটি বসে ছিল তিনি টেরই পাননি।”

শঙ্কুর তৈরি যন্ত্রমানবরা যেমন তাঁর প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গিয়ে কাজ করে, এই মানবের প্রাণীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। সংক্ষিপ্ত প্লট এবং অল্প চরিত্রের সমাহারে রচিত এই গল্পটি হয়তো শঙ্কুর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে থাকবে না। কিন্তু ওষুধের প্রভাব কেটে যাওয়ার পর ম্যাকাওটির বহুবর্ণ পালকের আলোয় ল্যাবরেটরিটা রঙিন হয়ে ওঠে; স্প্যানিশ এ সে বলে ‘গ্রাসিয়া’ বা ধন্যবাদ, তখন মানুষ ও পাখির অনির্বচনীয় বন্ধুত্বের আলোও যেন গল্প জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান আলোচনার শেষতম গল্পেও এক মানবের প্রাণীর দেখা পান শঙ্কু। সে আর কেউ নয়, ‘আদিম মানব’ বা হোমো অ্যফারেনসিস। ১৯৮৬ এর আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে বেরিয়েছিল ‘শঙ্কু ও আদিম মানুষ’। গল্পের পটভূমি হামবুর্গ যদিও তার শুরু আমাজনের জঙ্গলে। মিশর, আমাজনের জঙ্গল, সাহারা মরুভূমি বা সমুদ্রের তলদেশের মত স্থানগুলি শঙ্কুর গল্পের পটভূমি হয়ে ওঠে, কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য দুই দাবি মেটাতে। পাঠক গল্পের শুরুতেই রোমাঞ্চের পরিবেশ পেয়ে যান। এ গল্পের শুরুতেও আছে একটি চিঠি, যা লিখছেন নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ ক্লাইন -

“আমি যে আদিমতম মানুষের- যাকে বলা হয় হোমো অ্যফারেনসিস-একটি নমুনা সংগ্রহ করেছি সে খবর হয়তো তুমি কাগজে পড়েছ। আমি চাই তুমি একবার আশ্চর্য্য মানুষটিকে এসে দেখে যাও।”

এ গল্পে শঙ্কুর আবিষ্কার একটি বিশেষ ড্রাগ যা মানুষকে বিবর্তনের পথে অতি দ্রুত এগিয়ে যায়। কিন্তু এলিক্সিরাম নামক একটি উপাদানের অভাবে সে কাজ অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে। তাই আমন্ত্রণ নিতে ভাবতে হয়নি শঙ্কুকে। সঙ্গে ছিল নৃতত্ত্বের বইতে পড়া আদিম মানবকে দেখার আকর্ষণ। কিন্তু হামবুর্গ পৌঁছে তাকে দেখে শঙ্কুর কোনোও এক অজানা কারণে সন্দেহ হতে থাকে। এরসঙ্গে যোগ হয় হেরমান বুশের ঘটনা।

ক্লাইনের চিঠিতে জানা গিয়েছিল তার তরুণ সহযোগী হেরমান বুশ নদীতে পড়ে কুমিরের খাদ্যে পরিণত হয়। কিন্তু শঙ্কুর বন্ধু ক্রোল হেরমান বুশের একটি খাতা আবিষ্কার করে যাতে অদ্ভুত একটি তথ্য পাওয়া যায়। আমাজন অভিযানকালে ক্লাইন নিজেও কোনো এক গোপন গবেষণায় রত ছিল!

এটি জানামাত্র শঙ্কুর সন্দেহ হয় এবং ক্লাইন তাকে জাল এলিক্সিরাম দেওয়ায় সে সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। এক অভূতপূর্ব সমাপ্তি ঘটে যখন জানা যায় সে আসলে শঙ্কুর বিপরীত ওষুধ বানাচ্ছিল! আদিম মানুষটির গায়ে শঙ্কুর বানানো ড্রাগ এভটিউলিন প্রয়োগ করলে দেখা যায় সে আসলে হেরমান বুশ!

“অর্থাৎ সে শয়তানের দাওয়াই তৈরি করেছিল। ওটা ইনজেক্ট করলে মানুষ বিবর্তনের পথে পিছিয়ে যেত।”

এ গল্পের প্লট তুলনায় বিস্তৃত এবং আরো বেশি রহস্যময়। কল্পবিজ্ঞান আর রহস্য সেখানেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয় যেখানে মানুষের অনেকখানি অজানার অন্ধকার মিশে থাকে। এ গল্প সেজন্যই আধুনিক আর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সংযোগ নির্মাণ করতে চেয়েছে।

ক্লাইন শঠ, মিথ্যাবাদী। কিন্তু শঙ্কুর বিপরীত ওষুধ বানিয়ে সে আসলে শঙ্কুর চোখ খুলে দেয়। যে আবিষ্কার মানুষের খ্যাতির লোভ বাড়িয়ে মানবতাকেই শেষ করে দেয় তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভালো এমনটাই অভিমত শঙ্কুর-

“বিবর্তন নিয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ না করাই ভাল। যা হচ্ছে তা আপনা থেকেই হোক। আমার এভটিউলিনের শিশি আমার গিরিডির তাকেই শোভা পাবে- ওটা আর ব্যবহার করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।”

বিজ্ঞানীর সভাকে অনেকসময় হারিয়ে দেয় মানবিকতা, সভ্যতার প্রতি দায়িত্ব। এ গল্প পড়তে পড়তে তাই মনে পড়ে ‘আশ্চর্য’ গল্পের শেষটা। সেখানেও প্রিয় পোষ্য ইয়ে-কে হারিয়ে শঙ্কু ভেবেছিলেন - “মানুষের সব-জেনে-ফেলার লোভের একটা সীমা থাকা উচিত।” বিজ্ঞানের সীমা পেরিয়ে এখানে দেখা দেন মানবতার প্রতীক শঙ্কু। মানুষের বিস্ময় যদি বেঁচে না থাকে নিত্যনব আবিষ্কারের প্রেরণাই বা আসবে কোথা থেকে! একজন বৈজ্ঞানিকের আসল রসদ যে এই কৌতূহল।

যে লক্ষ্যে এই আলোচনার অবতারণা, অর্থাৎ ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের মতামত উপস্থাপনের আগে সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু চরিত্রের পরিকল্পনাকে আর একবার ফিরে দেখা প্রয়োজন।

‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’ গল্পের শেষে সত্যজিৎ জানিয়ে দেন সেই আশ্চর্য খাতাটা নাকী তাঁর চোখের সামনেই পিঁপড়ে উদরসাৎ করে ফেলেছিল। যেরকম সত্যজিৎ নতুন করে সন্দেহ বের করলেন সে বছরই লেখা এই গল্পটি। অর্থাৎ তিনটি সংখ্যার জন্য ধারাবাহিকভাবে একটি ছোটদের মজার গল্প লিখতে চেয়ে সত্যজিৎ এটি লিখলেন এবং এটিকে সিরিজ হিসেবে দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল না, এমনটা ভাবা অন্যায় হবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ ছিল অন্যরকম। তাই এর তিনবছর পর হয় ‘সন্দেহ’ এর দাবি নয়তো পাঠকের দাবিতে তিনি লিখলেন ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়’ (মে ১৯৬৪)। সেখানের ভূমিকায় জানালেন-

“ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে গিরিডিতে গিয়ে তাঁর বাড়ির হদিশ পাই, এবং তাঁর কাগজপত্র, গবেষণার সরঞ্জাম সব কিছুই হদিস পাই। কাগজপত্রের মধ্যে আরো একুশখানা ডায়রি পাওয়া গেছে। ...প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি নীচে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে আরো দেওয়ার ইচ্ছে আছে।”

অর্থাৎ এই সময় তাঁর মনে শঙ্কুকে সিরিজের রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে উঠেছে। আর এই গল্পেও আগেরটির মত মজাদার আবহ সেভাবে নেই, বরং তার জায়গা নিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার, এক সাধুবাবা, তাঁর কঙ্কাল থেকে প্রাণীকে জীবন্ত করার পৈশাচিক মন্ত্র, আর শঙ্কুর গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

যেকোনো সিরিজ সাহিত্যেরই বিবর্তন ঘটে। ফেলুদা, ঘনাদা এমনকী শার্লক হোমসও এর ব্যতিক্রম নন। শঙ্কুর ক্ষেত্রেও সে ছবি আমরা দেখতে পাই। ১৯৬১-১৯৯০ এই তিনদশকের আটত্রিশটি গল্প জুড়ে শঙ্কুর যে ছবিটা তৈরি হয়ে উঠেছে তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে অনেক। এবং চরিত্রটা তৈরি হয়ে উঠেছে পারিপার্শ্বিক মানুষদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায়।

শেষ গল্প ‘স্বর্ণপর্ষী’ আসলে শঙ্কুর প্রথম গল্প, যেখানে শঙ্কুর আত্মপরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু, বাবা ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। এই গল্পেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাই আমরা। এই গল্পের ছবি এঁকেছিলেন সমীর সরকার। পঁচিশ বছর বয়সের শঙ্কু এখানে নিপাট বাঙালি ভদ্রলোক, দাড়ির লেশমাত্র নেই। কিন্তু এই শেষ রচনায় সত্যজিৎ যেন শঙ্কুর জীবনাদর্শের সারাংশটুকু তুলে দিলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য নয় অর্থোপার্জন, বরং তাঁর অসাধারণ আবিষ্কার মিরাকিউরল যাতে মানুষের কাজে লাগে তাই পেটেন্ট নেবার কোনো চেষ্টা তিনি করেন না। এখানেই পাওয়া যায় তার আজীবন বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সকে যিনি চেয়েছিলেন শঙ্কু পেটেন্ট নিন। এই ঘটনা পড়তে পড়তে পাঠক ভাববেন ‘কর্ভাস’ গল্পের সেই লাইনটি -

“আর্গাস যেমন খরচের পরোয়া করে না আমি তেমন টাকা জিনিসটারই পরোয়া করি না।”

একজন আদর্শবান বিজ্ঞানী শুধু নয় বরং ছোটদের সামনে নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন। সত্যজিৎের সৃষ্টির মূল অবলম্বনই তো এটা। ছোটদের জন্য বানানো চারটে ছবিরই মূলসূত্র মানুষের মত মানুষ কাকে বলে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ফেলুদার গল্প ‘নয়ন রহস্য’তে অসামান্য গণিতের বুদ্ধিসম্পন্ন নয়নকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ফেলুদা সোজা হাঁকিয়ে দেন, লালমোহনবাবু বিড়বিড় করেন - “নো হেল্প ফর গ্যাংলারস।” আর মগনলালকে বলা সেই সংলাপ - “বিনা পরিশ্রমে আমি কোনো পারিশ্রমিক নিই না মগনলালজী।”

এনসাইক্লোপিডিক নলেজ এর ক্ষেত্রে ফেলুদা আর শঙ্কুর মিল তো আছেই, মিল আছে আরেকটা জায়গাতেও। দুজনেই আদ্যন্ত বাঙালি, ‘নেক্সট ডোর ইমেজ’। ফেলুদার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলা যায়, শঙ্কুও আর পাঁচজন বাঙালির মত উশীর ধারে বেড়ান, সাধারণ বাঙালি খাবারে অভ্যস্ত, চা-কফির নেশা আছে, বাগানের পরিচর্যা করেন। বিপ্লব মুহূর্তে মৃত্যুর কাছাকাছি এসেই তাঁর মনে পড়ে গিরিডির বাড়ি, প্রহ্লাদ আর নিউটনের কথা। বিরল প্রতিভার অধিকারী এক বিশ্ববরণে বিজ্ঞানী তাঁর ভেতরের মানুষটা কিন্তু নেহাত সাধারণ।

শঙ্কুর আরেকটা অন্যতম দিক হল নিজের দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। বিধুশেখর শিখে ফেলে দ্বিজু রায়ের গান, রোবু কয়েক হাজার বাংলা প্রশ্নেরও উত্তর জানে। ভারত আর জার্মানির সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা রোবুর গল্পে এবং ‘স্বর্ণপর্ণী’ আমরা পাই। ‘আশ্চর্য’ গল্পে ইয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি বলেন -

“রাখতে হলে আমার দেশের জু-তেই রাখব। কলকাতার চিড়িয়াখানা নেহাৎ ফেলনা নয়।”

অথবা রোবুকে বানানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন -

“বাংলাদেশে সামান্য রসদে বাঙালি বৈজ্ঞানিক কী করতে পারে সেটা কী বাইরের জগতের জানা উচিত নয়?”

তিনশো তেত্রিশ টাকায় রোবু তৈরি যা কার্যত অসম্ভব। কল্পবিজ্ঞানসুলভ কল্পনার অংশ তো আছেই তাছাড়া যেটা আছে সেটা হল এই ভাবনা, যে কাজের ইচ্ছে থাকলে টাকা অন্তরায় হয় না।

আমরা আগেই বলেছি শঙ্কুকে চেনা যায় পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়ায়। অন্য চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের বিন্যাস থেকে। সত্যজিৎ নিজেও কী এর ব্যতিক্রম? নিজের সৃষ্টির সমস্ত সময়টুকু জুড়ে তিনি মুখোমুখি হয়েছেন অজস্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার। ১৯৬২ এর চীন-ভারত যুদ্ধ ও ১৯৬৫ এর ভারত-পাক যুদ্ধ তাঁকে এতটাই ধাক্কা দিয়েছিল যে অনেকটাই বদলে ফেলেন ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ এর ছক। সেটা ছোটদের ছবির সীমানা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী শৈল্পিক প্রতিবাদ। প্রিয় শহর কলকাতার নানাদিক নিয়েই তোলা প্রতিদ্বন্দ্বী-সীমাবদ্ধ-জনঅরণ্য। গর্বাচেভ পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে বামপন্থার পতনধ্বনি ‘শাখা প্রশাখায়’।

শঙ্কু যেহেতু বাস্তবের মাটিতে ছিলেন না তাই এসব ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করে না। কিন্তু মর্গেনস্টার্নের লোভের বিপরীতে গিয়ে তিনি বলেন - “এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত আলো আমাকে আজীবন গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।” (মহাকাশের দূত)

একটা সর্বনেশে ফর্মুলাকে তিনি মুছে দেন চিরকালের মত, ক্যাসেট রেকর্ডার থেকে (ডঃ শেরিং এর স্মরণশক্তি)। হৃদয়হীন ধ্বংসকারী কারবোনির সামনে তাঁর অসহায় স্বীকারোক্তি - “তাজমহলকে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হতে দেখলে আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারব না। এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুই ভাল ছিল” (প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ.এফ.ও)। অথবা, মৃত্যুর পশ্চাদপটে চলছে তুমুল করধ্বনি শঙ্কু মনে মনে বললেন - “কম্পিউটারের জয়, বিজ্ঞানের জয়” (শঙ্কুর পরলোকচর্চা)।

আপাদমস্তক বিজ্ঞানমনস্ক এক মানুষ শঙ্কু অবশ্য তাত্ত্বিক ও অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল ক্লেয়ারভয়েল, মাহোজাঘো, ব্ল্যাক ম্যাজিক সবই একদিন বিজ্ঞানের আওতায় এসে যাবে। এ বিশ্বাস তাঁকে দিয়েছিল আজীবনের বিজ্ঞানসাধনা, যাঁকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন নিঃশর্ত মানবকল্যাণে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বীরা বারবার পরাজিত তাঁর সামনে। তারা কেউই সাধারণ নয়, প্রায় প্রত্যেকেই এক একজন আবিষ্কারক কিন্তু মানুষের ভালো নয়, স্বার্থসিদ্ধিই তাদের উদ্দেশ্য। তাই নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে গিয়েও তাদের হারতে হয়। প্রত্যেক গল্পের ডায়রির শেষ পাতায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসার রোমহর্ষক কাহিনি লেখেন শঙ্কু।

‘সোনার কেব্লা’ গল্পে জাল ভূপর্ষটক ছিলেন মন্দার বোস। শঙ্কু প্রকৃত অর্থে ভূপর্ষটক। ক্লাইনের চিঠিতে জানা যায় তিনি বছরে একবার ইউরোপ যান। ৩৮টি গল্পের একটি মহাকাশে, ছটি গিরিডিতে। বাকী ৩১টি গল্পেরই পটভূমি বিদেশ। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়ানো তাঁর বিচরণস্থল। আলাদাভাবে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন জার্মানি, গ্রিস, নরওয়ে এবং অবশ্যই মিশর সম্পর্কে। সেসব গল্পে টুকরো টুকরো হয়ে আসে সেখানের সমাজ, মানুষ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য যে তাঁকে মুগ্ধ করে সেটা বারবার বোঝা যায়। ফেলুদা বিদেশ গিয়েছিলেন মাত্র দুটি গল্পে, তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র ভারতের নানা শহর। শঙ্কুকে বিশ্বপথিক বললে খুব ভুল হবে না নিশ্চয়।

১৯৮৬ সালে একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ অপর্ণা সেনকে বলছেন-

“শঙ্কু যখন প্রথমে evolve করে, তখন শঙ্কু was a slightly comic character. It was a take-off science fiction... সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা tongue-in-cheek ব্যাপার ছিল। পরে ক্রমশ serious চরিত্র হয়ে গেল।”^৩

স্রষ্টার ভাবনার সঙ্গে পাঠকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা জুড়ে নিতে পারি আমাদের মতামত। একজন সিরিয়াস বিজ্ঞানী শুধু নয়, শঙ্কুকে তিনি করতে চাইলেন একজন প্রকৃত মানুষ। তাই তাঁর মধ্যে এসে মিলল যাবতীয় মানবিক গুণ, যুক্ত হয়ে গেল বিশ্বের নানা অংশের ভূগোল, নানা ধরনের মানুষের আন্তরবৈশিষ্ট্য। এই বহুস্বরের মধ্যে শঙ্কু স্বভাবগুণে বিশিষ্ট তো হয়ে রইলেনই, কিন্তু গল্পগুলোও নিছক কল্পবিজ্ঞানের বাইরে ‘ভাবার মত গল্প’ হয়ে উঠল।

সত্যজিৎ নিজের লেখা সম্পর্কে বলতেন সেগুলো পড়ার minimum age দশ। কোনো upper limit নেই। অর্থাৎ নিজের লেখা যে প্রাপ্তবয়স্কদেরও ভালো লাগবে তা জানতেন তিনি। বুঝদার পাঠক যেমন তাঁর লেখাকে নানাভাবে বিচার করবে তেমনই তথ্যগত কিছু ত্রুটিও খুঁজে পাবে। ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও গোরিলা’ গল্পে পাঁচশো গোরিলার পায়ের ছাপের কথা আছে যেখানে ১৯৮১-তে National Geographic জানাচ্ছে গোরিলার সংখ্যা দুশো উনচল্লিশ। সম্ভার্স, শঙ্কুর বন্ধু জীববিজ্ঞানী, না ভূতত্ত্ববিদ এ নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। পারাকে সবচেয়ে বেশি ওজনের ধাতু বলা হয়েছে, যা রসায়নমতে ভুল। (স্বপ্নদ্বীপ)

একটি ভুল ধরিয়ে দিয়ে সত্যজিৎকে চিঠি লিখেছিলেন আনন্দ ঘোষ হাজরা। দ্রুত উত্তর দেন সত্যজিৎ, তথ্যগতভাবে ভুলটা স্বীকার করে। সঙ্গে এও লেখেন গল্পের খাতিরে এই তথ্যটুকুর জন্য বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। বিশাল মাপের সৃষ্টিতে দু-একটি অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। সেসব দূরে সরিয়ে আমরা ভাবতে পারি শঙ্কুকাহিনির অসামান্য উপভোগ্যতার কথা। এ যে নির্ভেজাল science fiction নয় তা আমরা আগেই বলেছি, সেটার নিদর্শন পেতে হলে আমাদের পড়তে হবে ‘সেন্টোপাসের খিদে’। সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য নয়, এখানের পাঠকের বিজ্ঞানপাঠ সীমিত। তাই কল্পবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সেভাবে স্বীকৃতি কোথায় পেলেন? প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সেভাবে কী জনপ্রিয় হলেন? অথচ তাঁর অনেক কাহিনিতেই আছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্বাদ। অদ্রীশ বর্ধন বা অনীশ দেবের লেখাও সেভাবে সাহিত্যপদবাচ্য হওয়ার স্বীকৃতি পায়নি। পাশ্চাত্যে যেটা সসম্মানে পান আইজ্যাক অ্যাসিমভ, বা রে ব্র্যাডবেরি। সেদিক দিয়ে সত্যজিৎ এর পাঠকসংখ্যা অনেক বেশি, এরজন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে তাঁর অপূর্ব সাবলীল ভাষা এবং উপস্থাপনকে। একটা জনপ্রিয় শিশুদের পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পগুলো অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছিল পাঠককে আমোদিত করার। অন্যদিকে হয়তো বিশ্বখ্যাত পরিচালক হওয়ার দরুণ, বাঙালি সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হওয়ার দরুণ তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল বেশি।^৪ তবে শঙ্কুর অসামান্য জনপ্রিয়তা লেখক সত্যজিৎ নয় বরং বাঙালি পাঠকেরই সৌজন্য। ছয় দশকের কাছাকাছি সময় ধরে যার জনপ্রিয়তা অটুট, সেই শঙ্কু তো আসলে বাঙালির অহঙ্কার!

Reference:

1. John, Clute, Stableford Brian, Nicholls Peter (1993). ‘Definitions of SF’. In Clute, John; Nicholls, Peter (eds.). Encyclopedia of Science Fiction. London, pp. 311-314
2. বসু, রাজশেখর, ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’, ‘বিচিন্তা’
3. অপর্ণা সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পুনর্মুদ্রণ- ‘প্রথমা’, ১ মে ২০১৪
4. রায়, কিল্লর, ‘প্রেমেন্দ্র স্মৃতিলিপি’, ‘প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা-গল্পমেলা’, ২০১১

Bibliography:

‘সত্যজিৎ একাই ১০০’, সম্পাদ: সন্দীপ রায়, শিশু কিশোর আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৮

‘সত্যজিৎ রায় : বিশ্বজয়ী প্রতিভার বর্ণময় জীবন’- অরুণ মুখোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬
‘সেরা কল্পবিজ্ঞান’, সম্পাদ: অনীশ দেব, কলকাতা, ১৯৯১

পত্র-পত্রিকা -

‘আনন্দমেলা’, ১৩ মে ১৯৯২

‘পশ্চিমবঙ্গ’, সত্যজিৎ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯২

‘প্রথম এথন’ - সত্যজিৎ রায়, মে ২০১৪

‘গল্পমেলা’, প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা, ২০১১